Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 263 – 272
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রাজনীতি, দেশভাগ ও গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস

ড. মুঈদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়
Email ID : mueedul.islam@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Partition, Congress, Muslim League, Hindu Mahasabha, Separation, Tragedy, Relation, Devided, Upheaval, Communalism.

Abstract

No one knows the extent of suffering common people had to suffer after partition. Many novelists have written many novels about this but Gourkishore did not follow that path. He wrote about the reasons for partition. Why is the country divided? Where was our error, while fulfilling personal small interests, how low we adopted for the greed of rank! Gourkishore Ghosh's trilogy ('Jal Pade Pata Nade' - 1961, 'Prem Nei' - 1981 and 'Prateveshi' 1995) is set in 1922 - 47. A dark chapter was written in Bengal as well as the whole of India in the long 25-year political whirlwind. A history of ups and downs of Hindu Muslim relations. This trilogy is about how the relationship between the two communities gets burnt due to political upheaval. In this episode, Gourkishore portrays the vulnerability of Hindu-Muslims by mixing the tragedy of history with the personal tragedy of the characters. The activities of political party leaders like Congress, Muslim League, Hindu Mahasabha etc. are endangering the common people. Excitement throughout the state. Each leader has a unique perspective. Keeping the problem alive became their main tool. It is not wrong to say that duplicity among leaders has always been one of the 'political tools'. When the Congress and the Muslim League split into Hindu parties and Muslim parties unnoticed by everyone, how the seeds of communalism were rooted among the big leaders, Gourkishor brought out the 'suppressed history'. He was a journalist himself. He presented the history of the pre-independence era with that journalistic approach. The difference between the leaders due to sometimes transition or decline of thought also became the main obstacle to Hindu-Muslim union. Sudhamoy was deprived of his Job. The girl of Chobi was died. Shamim-Phulki's love was separated. So we can say, Partition did not carry any message of harmony, but rather fueled the disunity.

Discussion

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবন বিকশিত হত প্রধানত ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের শিল্প-সাহিত্যেও তার রঙ লাগে। এখন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান হয় ইস্যু ভিত্তিক। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, হিন্দু মহাসভা, মোহামেডান লিটারেরি এসোসিয়েশন, কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, স্বরাজ্যদল, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য, মোহামেডান, মোহনবাগান, হিন্দুমেলা প্রভৃতির ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আমরা অবগত হই রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে পার্থক্য কতোখানি। বস্তুত, বাঙালির সাংস্কৃতিক তৎপরতা ত্রিশের দশকে রাজনৈতিক কারণেই বহুমাত্রিকতা অর্জন করেছিল। আর রাজনৈতিক চেতনা বিবর্তিত হয়েছিল মূলত তিনটি কারণে - ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, কৃষক শ্রমিক শোষিত শ্রেণির মুক্তি এবং হিন্দু ও মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা - মুসলমানদের পাকিস্তান স্বপ্ন। এই উদ্দেশ্য পূরণে ভারতীয় রাজনীতিতে একে একে কংগ্রেস, মুসলিম, লিগ, কৃষক-প্রজা পার্টি, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দলের উত্থান হয়। এরই সাথে সাথে হিন্দু মুসলমানদের সংস্কৃতির বিবর্তনের জন্য বহু প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন—

> "হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুদের এবং আলীগড় কলেজ ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যেরূপ উন্নতির কারণ, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও পূর্ববঙ্গ ও আসামে মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঠিক সেইরূপই উন্নতি সাধন করিয়াছে।"[১]

বিশ শতকের সূচনায় বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দিয়েছিলো ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে। বিশ শতকের সূচনাই উনিশ শতকের জাগরণের ধারাবাহিকতায় জাগ্রত হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের জোর নিয়ে। এ জাগরণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সহায়ক ছিল। এই সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে সামনে রেখে জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট পার্টি খুবই সক্রিয় ছিল। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের পর 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' দুই দলে বিভক্ত হলে সাম্প্রদায়িকতা চরমে পৌঁছাল। কংগ্রেস 'হিন্দু' এবং মুসলিম লিগ 'মুসলিম' দলে পরিচিত হল। বঙ্গভঙ্গে মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা বেশি হওয়ায় হিন্দুরা সরকারকে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। অবশেষে ১৯১১ সালে লর্ড কার্জন কৌশল অবলম্বন পূর্বক বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন। মুসলমানদের মনে এবার ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধলো। বঙ্গভঙ্গ রদ করার পরেই রাজধানী কলকাতাকে সরিয়ে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হল। বাংলার রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে গেল। বাংলার মুসলমানকে খুশি করার জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' করার কথা ঘোষিত হল এবং বলা হল, এখানে মুসলমানদের চাকরির সুযোগ বেশি দেওয়া হবে। কোনো পদে মুসলমান প্রার্থী থাকলে সেখানে অন্য কাউকে আনা হবে না বলেও জানানো হল। হিন্দু সম্প্রদায় প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হল। স্মর্তব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দুসমাজের প্রবল বিরোধিতার বিবরণ আছে রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'স্মৃতিকথা' এবং 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে। লক্ষণীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দু সমাজের প্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া গেলেও দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কোনো প্রতিবাদ হল না। কারণ সেক্ষেত্রে অবাঙালি হিন্দুদের আগ্রহ ছিল না। আঞ্চলিকতার স্বার্থে এতে বরং তারা খুশিই হয়েছিল।

ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দুই তিন দশকের মধ্যেই অবাঙালি হিন্দু ও মুসলমান প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। বাঙালি হিন্দুরা সংখ্যালঘু হবার ভয়ে বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু পরে যে অবস্থায় বঙ্গদেশের সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল তাতেও তাঁরাই সংখ্যালঘু রয়ে গেলেন। ১৯৪৭ সালে আবার সেই বঙ্গ বিভক্ত হল ইংরেজদের কূটকৌশলে ও কংগ্রেস, মুসলিম লিগের আগ্রহে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলমানরা অভিজ্ঞতায় লাভবান হয়েছিলেন। ইংরেজ শাসকদের নিত্য নতুন 'রূপ', 'প্রতারক রূপ' প্রতক্ষ্য করে বুঝলেন, তাঁদেরকে কোনো মতেই বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং সবকিছুই নতুন করে তাঁরা ভাবতে লাগলেন।

মধ্যবিত্ত মুসলিমদের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠার আরেকটি কারণ ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয়। নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্তের মনে নানা ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের যে বাসনা জেগে উঠেছিল, ইংরেজ শাসনাধীনে তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারছিল না। ফলত তাঁদের মনে ইংরেজদের উপর ক্ষোভ প্রবল

হল। যদিও ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে সরকার পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলমানদের কিছু স্বার্থ রক্ষা করেছিল কিন্তু এতে আশা মেটেনি বরং তাঁদের দাবি আরও জোরদার হল। ইতিমধ্যে ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে সারা বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন মহাত্মা গান্ধি, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ।

১৯২৯ - ৪৭, এই সংকটময় সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরে দ্রুত পালাবদল ঘটে। ১৯২৯-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। চাষিদের দেনার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। হিন্দু মুসলিম বিরোধ চরমে পৌঁছায়। ১৯২৯ সালে গান্ধী কংগ্রেসের রাজনীতিতে একাধিপত্য বিস্তার করে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে ঘোষণা করলেন, ভবিষ্যতে কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়গুলির নিকট সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হলে কংগ্রেস তা গ্রহণ করবে না। ১৯৩০-৩৫-এর মধ্যে একাধিক ঘটনা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আরও জটিল করে তোলে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলাদলি, 'গান্ধি-আরউইন চুক্তি', আইন অমান্য আন্দোলনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। নেতাজী সহ অনেক বুদ্ধিজীবীরা 'গান্ধি-আরউইন চুক্তি'র কঠোর সমালোচনা করেন। অন্যদিকে 'পুণা চুক্তি'র সংবাদ প্রকাশিত হলে বর্ণহিন্দুরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কিন্তু মুসলমানেরা হিন্দুদের এই মনোভাবের নিন্দা করেন। কারণ চুক্তির শর্তানুসারে ব্যবস্থাপক সভায় ৮০ জন সাধারণ হিন্দু সদস্যদের মধ্যে তপশিলভুক্ত ৩০ জন সদস্য নির্বাচনের কথা ছিল। পূর্বে যার সংখ্যা ছিল মোট ২৫০ জনের মধ্যে সাধারণভাবে নির্বাচিত হিন্দু সদস্যদের সংখ্যা ৮০-র বেশি হবে না - এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ হিন্দু নেতারা 'কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি' গঠন করেন। এতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে।

১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের ভিতর থেকে 'বাঙলা জাতীয় দল' (Bengali Muslim Party) বেশি শক্তিশালী ছিল। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল ফুজলুল হকের 'কৃষক-প্রজা পার্টি'। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কৃষক প্রজা পার্টি হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে মুসলিম লিগ ৫৯টি, কৃষক প্রজা পাটি ৫৮টি ও কংগ্রেস ৬০টি আসনে জয়লাভ করে। ফজলুল হকের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সকার গঠন করতে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে মুসলিম লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হল। ফলে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লিগের প্রাধান্য বিস্তার ঘটল। যদিও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক। কৃষক সমাজই তখন বাংলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। তাঁর আমলে 'ঋণশালিসী বোর্ড' (১৯৩৮), 'প্রজা-স্বত্ব-আইন' (১৯৩৯), 'মহাজনী (১৯৪০), বিপ্লবী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, সাম্রাজ্যবাদী ও জমিদারি শোষণ থেকে মুক্তির আনন্দ ও উন্নতির আশায় বাংলার কৃষক সমাজ সেদিন উজ্জীবিত হয়েছিলো।

অতিরিক্ত আকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে মুসলিম লিগ ১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাবে'র নামে পাকিস্তান দাবিও করেছিলেন। তবে ফজলুল হক অনেক অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং পাকিস্তান দাবিও তিনি করেননি। এর পিছনে কূটনৈতিক চাল চেলেছিলেন জিন্না। পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সোচ্চার হন। ইতোমধ্যে ১৯৪১ সালে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভের জন্য তৎপর হন। কিন্তু জিন্না ঘোষণা করলেন, মুসলিম লিগের স্বীকার না করা পর্যন্ত মুসলিম লিগ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সরকারকে সহায়তা করবে না। এদিকে ফজলুল হক জিন্নার নির্দেশ মতো কাজ করতে রাজি নন। হক-জিন্নার মতানৈক্য সৃষ্টি হল। এমনকি ১৯৪১ সালের আসষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় ফজলুল হকের বিরুদ্ধে নিন্দা করা হয়। প্রদেশের লিগমন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দ ফজলুল হককে জিন্নার সঙ্গে আপোষ করার পরামর্শ দিলেন। শেষপর্যন্ত হক সাহেব ১৯৪১ সালের ২৮শে অক্টোবর সমর পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন তথাপি জিন্নার সঙ্গে আপোষ করেননি। পরবর্তীকালে ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে 'শ্যামা হক মন্ত্রীসভা' গঠন করেন। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল এই মন্ত্রীসভা। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

> "হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ বাড়াইয়া ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য গবর্নমেন্ট মুসলিম লীগের রাজনীতিক প্রভাব বাড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ফজলুল

হকের পরিবর্তে মুসলিম লীগের প্রভাব ও ক্ষমতা যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। সুতরাং ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলার মন্ত্রীসভা যাহাতে মুসলিম লিগের ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাচ্যুত না হয়, এই জন্য শ্যামাপ্রসাদ তাহার সহিত যোগ দিলেন।"[২]

শ্যামা-হক মন্ত্রীসভায় নয়জন মন্ত্রীর মধ্যে চার জন হিন্দু এবং পাঁচ জন মুসলমান ছিলেন। আর তাতেই বিপত্তি। মুসলিম লিগ একে 'হিন্দু-মন্ত্রীসভা' এবং কংগ্রেস 'মুসলমান মন্ত্রীসভা' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

এই সময় ভারতের রাজনীতি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। সাম্প্রদায়িকতার রঙ লাগে। হিন্দু-মুসলিম বিভাজন ব্যাপকতর হয়। কমরেডগণও তখন 'হিন্দু কমরেড' ও 'মুসলমান কমরেডে' ভাগ হয়। 'পাকিস্তান' ও 'ভারতের' স্বাধীনতার জন্য উভয় জনগণই উদগ্রীব হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান অর্জনের জন্য ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' ঘোষণা করে। কলকাতায় ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। বলাবাহুল্য, গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাসে এই রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণগুলি স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

তাঁর ট্রিলজির ('জল পড়ে পাতা নড়ে' - ১৯৬১, 'প্রেম নেই' - ১৯৮১ ও 'প্রতিবেশী'- ১৯৯৫) প্রেক্ষাপট ১৯২২-৪৭। দীর্ঘ ২৫ বছরের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে এক কালো অধ্যায় রচিত হয়েছিল। হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের উত্থান-পতনের ইতিহাস। রাজনীতির দোলাচলতায় উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কীভাবে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় তারই বয়ান এই ট্রিলজি। এই পর্বে গৌরকিশোর হিন্দু-মুসলিমের দুর্বলতার চিত্র তুলে ধরে ইতিহাসের ট্রাজেডির সঙ্গে চরিত্রের ব্যক্তিগত ট্রাজেডির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি রাজনৈতিক দলনেতাদের কার্যকলাপে সাধারণ মানুষ বিপন্নতার পথে। সমগ্র রাষ্ট্রে উত্তেজনা। এক একজন নেতার দৃষ্টিভঙ্গি এক একেকরকম। সমস্যা জিইয়ে রাখা তাদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। নেতাদের মধ্যে দ্বিচারিতা, অন্যতম 'রাজনৈতিক হাতিয়ার' হিসেবে সবসময়ই ছিল বললে ভুল হয় না। সবার অলক্ষ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ কখন যে 'হিন্দু দল' ও 'মুসলিম দলে' বিভক্ত হয়ে পড়েছিল! বড়ো বড়ো নেতাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ কীভাবে প্রোথিত ছিল, গৌরকিশোর হ্যাঁচকা টানে সেই 'চেপে রাখা ইতিহাস'কে বার করে এনেছেন। তিনি নিজে একজন সাংবাদিক ছিলেন। সেই সাংবাদিকতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের ইতিহাসকে তুলে ধরলেন। চিন্তার কখনো উত্তরণ কখনোবা অবনমনের ফলে নেতাদের মধ্যে যে বিভেদ তৈরি হয়েছিল, তেমনি তা হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বঞ্চিত হয়েছিল সুধাময়ের চাকরি। মারা গিয়েছিল ছবির মেয়ে। বিচ্ছেদ হয়েছিল শামিম-ফুলকির প্রেম।

একদিকে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার জন্য গড়ে উঠেছিল হিন্দু সংগঠন অন্যদিকে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম সংগঠন। ১৯০১ সালে লালা লাজপত রায় একটি হিন্দু রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হল। এবং পরের বছর ১৯০৭-এ পাঞ্জাব প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার জন্ম হল। অতএব দুটি সম্প্রদায়ের স্বার্থ দুটি ভিন্ন খাতেই বয়ে গেল। একদিকে 'আর্য সমাজের শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলন, অপরদিকে মুসলমানের 'তবলিগ' ও 'তনজিম' সারা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে।

'অসহযোগ আন্দোলনে' (১৯২২) হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ একসঙ্গে অংশগ্রহণ করলেও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। হিন্দু নেতারা আন্দোলন করেছিলেন স্বরাজের জন্য। আর মুসলমানরা তুরস্কের সুলতান খলিফার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য। তাই আন্দোলন বন্ধ হলে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা আরো বাড়ে। এই তিক্ততা কমাতে চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার মুসলমান নেতাদের সঙ্গে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি উভয়ের স্বার্থে রচিত। কিন্তু চুক্তিতে বলা হয়েছিল, মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে মিছিল করা যাবে না এবং ধর্মের জন্য গো-হত্যা করা যাবে। এছাড়া সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের জন্য এত বেশি সংরক্ষণ করা হয়, যা বাংলার অভিজাত শ্রেণির হিন্দু নেতারা মেনে নিতে পারেননি। তাই চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর (১৯২৫, ১৬ই জুন) পর বিধানচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতারা মিলে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল করে ছাড়লেন। ১৯২৮ সালে জমিদারদের স্বার্থে 'বেঙ্গল টেনান্সি' পাশ হলে তাঁদের শোষণের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষেরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। ফলে আক্রাম খাঁ, সৈয়দ নওশের

আলী, ফজলুল হক, আবুল মনসুর আহমেদ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা কংগ্রেস ত্যাগ করে 'কৃষক-প্রজা পার্টি' (১৯২৯) গঠন করলেন। তারপর এল 'সাইমন কমিশন'। এতে একজনও ভারতীয় না থাকায় তা বাতিল হয়ে যায়। ঠিক সেই সময় মতিলাল নেহেরু একটি কমিটি গঠন করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন যা 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার জন্য কলকাতায় সর্বদলীয় বৈঠক বসে। এতে ২৪ জন প্রতিনিধির পক্ষ থেকে জিন্না যে প্রস্তাব আনেন তার মূল বক্তব্য ছিল এরকম যা উপন্যাসেও বিদ্যমান -

(ক) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক তৃতীয়াংশের কম হবে না।

(খ) নেহেরু রিপোর্টে প্রস্তাবিত প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত না হলে পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পাবেন।

(গ) বাদবাকি ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে থাকবে।

হিন্দু মহাসভার নেতারা এই দাবিগুলি মানতে রাজি ছিলেন না। ফলে মতানৈক্য থেকেই গিয়েছিল। বস্তুত, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু মুসলমানের সংঘাতের প্রধান কারণ হল বাংলার শাসনভার। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পেশায় এগিয়ে থাকা হিন্দু সম্প্রদায় বাংলার শাসনভার চাইছিলেন। অন্যদিকে, বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ট। তাই তাঁরাও দাবি করেছেন বাংলা তাঁদেরই হাতে থাকা উচিত। 'প্রেম নেই' উপন্যাসে সর্বত্রই এই রাজনীতির খেলা। এই রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক মানুষ কেমন ভাবে তলিয়ে যায়, তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মেজকর্তা, শফিকুল ওরফে ফটিক এবং শামিম।

জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক ও প্রজার লড়াই 'কৃষক-প্রজাপার্টি'র জন্ম দিয়েছিল। বলাবা হুল্য, মুসলমান আসনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল কৃষক প্রজাপার্টি ও মুসলিম লিগ। কৃষক প্রজাপার্টি নির্বাচনে নেমেছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, মহাজনি কারবার নিয়ন্ত্রণ, ঋণ সালিসি বোর্ড স্থাপন, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে। অন্যদিকে, মুসলিম লিগের একমাত্র দাবি ছিল মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা। নির্বাচনে কৃষক প্রজাপার্টি (৩১.৭৮ শতাংশ) মুসলিম লিগের (২০.১০ শতাংশ) থেকে বেশি ভোট পেলেও মুসলিম লিগ (৪০) কৃষক প্রজাপার্টির (৩৫) থেকে বেশি আসন পেয়েছিল। অন্যদিকে, ৬০টি আসন দখল করে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। এই পরিস্থিতিতে শফিকুল কোন্ পার্টিকে সমর্থন করবে? মুসলিম লিগের মধ্যে তো হিন্দু-বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট। কেবল 'মুসলমানের স্বার্থ' ফটিক মানতে পারবে না। তার চেয়ে বরং কৃষক-প্রজা পার্টি ভালো। কিন্তু সেখানেও সংশয় উঁকি মারে। মুসলমানরা ভোটে জিতে যদি কেবল মুসলমানের কোলে ঝোল টেনে নেন, এটা যেমন খারাপ, তেমনি হিন্দুর ক্ষেত্রেও তাই, কৃষক-প্রজা পার্টির পক্ষেও তা সমান। ফটিক চায় জনসাধারণের সার্বিক স্বার্থ। তাহলে ফটিক কোন দিকে যাবে? কংগ্রেসের দিকে? কংগ্রেসকে এক সময় তার মনে হয়েছিল 'হীরে'। কিন্তু আজ সে উপলব্ধি করেছে 'হীরে' নয়; 'কাঁচ'। সেদিনের সে ব্যথা শফিকুল ভুলতে পারে না। এক সময় মুসলমানরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি তুলেছিলেন। সেইসময় হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানের একটা চেষ্টা 'নেহেরু কমিটি' করেছিলেন। কংগ্রেস সরকার জানালেন যে, স্বতন্ত্র নির্বাচনের মানেই হল এই যে, তাতে এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের প্রেম ও আস্থার অভাব রয়েছে। একথা শুনে মি. জিন্না, মাওলানা মোহাম্মাদ আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতারা এই দাবি তুলে নিয়েছিলেন। মিশ্র নির্বাচন বা যুক্ত নির্বাচন স্বীকার করে নেওয়ার পর মুসলিম নেতারা আবেদন জানিয়েছিলেন 'প্রাপ্ত বয়স্কমাত্রকেই ভোটাধিকার' দিতে। আবার পাঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা যাতে হয় সে দাবিও করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসি নেতারা এতেও ঘোর আপত্তি জানান। তাদের বক্তব্য, আসন সংরক্ষণের দাবির ভিতর স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিষধর বীজগুলি লুকিয়ে রয়েছে। সুতরাং জাতীয়তার উচ্চ ও মহান আদর্শের দিকে লক্ষ রেখে মুসলমানদের এ দাবিও প্রত্যাখ্যান করা উচিত। শফিকুল একথাও মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু তপসিলি হিন্দুদের হাতে রাখার জন্য যে নির্বাচন পদ্ধতি কংগ্রেস চিরকালের জন্য মেনে নিলেন তা মুসলমানের বেলায় হল না কেনো? শফিকুল এর উত্তর আজও খুঁজে পায় না। সে বিপন্ন বোধ করে। বস্তুত, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দু আরো হিন্দু, মুসলমান আরো মুসলমান হয়ে ওঠে।

মুসলমানদের দুর্দশার জন্য খালেক, মৌলবী আবু তালেব চৌধুরী কংগ্রেসের দোষ দেয়। ফটিক তা মানে না। ফটিকের মনে হয়েছে, খালেক যে মুসলিম ইন্টারেস্টের কথা ভাবছে তা গুটিকয়েক সুবিধাভোগী মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা হবে। কিন্তু শফিকুল ভাবে সমগ্র দেশটার কথা, যেখানে হিন্দু মুসলিম সবারই স্বার্থ রক্ষিত হবে। তথাপি শফিকুলের এ কথা কি টিকবে? কংগ্রেস তো মোহাম্মাদ আলী, জিন্না প্রমুখের দাবি 'স্বতন্ত্র নির্বাচন'কে বয়কট করলেন। 'আসন সংরক্ষণ'কেও নস্যাৎ করলেন, তাও আবার 'নির্দিষ্টকাল' পর্যন্ত। যে কংগ্রেস জাতীয়তা ও মহান আদর্শের দিকে লক্ষ রেখে মুসলমানদের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করতে বলে, সেই কংগ্রেস কীভাবে জাতীয়তার উচ্চ ভাব ও মহান আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে তপসিলী হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতিকে 'চিরকালের জন্য' মেনে নিলো? ফটিক একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কংগ্রেস, তার কংগ্রেস এই করলো! শফিকুল আজও ভাবে, কংগ্রেস যে যুক্তিতে তপশিলী হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণ করেছিলো, সেই একই যুক্তিতে মুসলমানদের জন্যও তো করতে পারতো! তাও আবার 'নির্দিষ্ট কালে'র জন্য। কেনো করলো না! এ তো সুবিধাবাদী নীতি। অদূরদর্শিতা। মুসলমানদের দাবিগুলো সম্পর্কে কংগ্রেস আর একটু বিচক্ষণতা, বিবেচনাবোধ দেখাতে পারতো না? কিন্তু দেখালো না কেনো?-

> "সে কি কংগ্রেস হিন্দু নেতাদের হৃদয় এবং বুদ্ধি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিল বলে? এর ফলে কংগ্রেস কী পেল? কংগ্রেসের জাতীয়তার আবরণটা ভুয়ো। সেই কারণেই কংগ্রেসের কাছেও হিন্দু স্বার্থটাই দেশের স্বার্থ।"[৩]

মেজকর্তা বলেছিলেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের সংখ্যা যতই বাড়বে সাম্প্রদায়িকতা ততো মাথাচাড়া দেবে। এ কথা ফটিক টের পেয়েছে। মুসলমান বলেই হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে তার জায়গা হয়নি। কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণ নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তার প্রমাণ, বশির- সাজ্জাদ-গয়ার কাহিনি। একসঙ্গে থাকা-খাওয়া, এমনকি গয়াকে তারা নিজের সন্তানের মতো করে দেখেছে। গয়াও তাদের পিতৃতুল্য সম্মান করেছে। মেজবাবু আরও বলেছেন, এই দুই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলিমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান ক্ষেত্র হবে অর্থনীতি ও রাজনীতি। তিনি আরো জানালেন, যেখানে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, সেখানেই নেতারা মিলন মিলন করে চেঁচাচ্ছেন। তাহলে মিলন কীভাবে সম্ভব? ঔপন্যাসিক প্রতিকারের রাস্তা বাতলে দিলেন— দেশে অভাব, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্য দূর করতে হবে এবং উপর থেকে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে, সর্বোপরি নিজেকে যুক্ত করতে হবে সেই কর্মের সঙ্গে। আর সে কাজ শুরু করতে হবে একেবারে নিচের তলার মানুষদের কাছ থেকে এবং বলাবাহুল্য, সে কাজ হিন্দু মদতপুষ্ট কংগ্রেসের দ্বারা হবে না, মুসলিম মদতপুষ্ট মুসলিম লিগের দ্বারাও সম্ভব নয়। সেজন্য গৌরকিশোর 'কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন' করতে উদ্যত। ফটিক কথাটা শুনেই চমকে গেল। সত্যিই কংগ্রেস প্রজা-কোয়ালিশন' হবে। এতোদিন ফটিক যে আশা করে এসেছিলেন আজ তাহলে পূর্ণ হবে। হিন্দু-মুসলিম মিলন হবে। আনন্দে ফটিক আত্মহারা। দেশে তাহলে আর সাম্প্রদায়িক সমস্যা থাকবে না। ধর্ষণ, হত্যা, উদ্ধত মুসলমান, উদ্ধত হিন্দু দেখতে দেখতে ফটিক আঁতকে উঠেছিল। তাই 'কংগ্রেস প্রজা কোয়ালিশন' ছিল তার শেষ ভরসা। শর্তাবলী আগেই ঠিক করা ছিল। ব্যারিস্টার জে. সি গুপ্তের বাড়িতে বসে শুধু সই করার পালা। জে. সি. গুপ্ত শর্তগুলি পড়ে সবাইকে শোনালেন—

১. স্বরাজ দাবির প্রস্তাব গ্রহণ
২. রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি
৩. প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন
৪. মহাজনি আইন পাশ।

এই শর্তাবলীর উপরে কেউ কোনো আপত্তি করেননি। সবাই চুপচাপ। এবার সই করার পালা। হঠাৎ আবুল মনসুর আহমেদ জানালেন, 'রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি' এই দফাটাকে দুই নম্বর থেকে চার নম্বরে নামিয়ে আনা হোক। কেননা, লাটসাহেব যদি বন্দিমুক্তির প্রশ্নে 'ভেটো' প্রয়োগ করেন, তবে মন্ত্রীসভাকে আত্মসম্মানের খাতিরে পদত্যাগ করতে হবে। মনসুরের যুক্তি ছিল, মুসলিম লিগ তাঁদেরকে কংগ্রেসের লেজুড় বলে আখ্যা দিয়েছে। এবং কৃষক-খাতকের কল্যাণে সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে ভাঁওতা বলে অভিহিত করেছে। এখন যদি তারা কৃষক-খাতকদের হিতের জন্য কোনো কিছু আইন

পাশ না করেই রাজনৈতিক ইস্যুতে পদত্যাগ করেন তাহলে মুসলিম লিগের মিথ্যে অভিযোগটাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা এ নীতি মানলেন না। তাঁরা বললেন, রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির প্রশ্নটা জাতীয় সম্মান অসম্মানের প্রশ্ন। এর সঙ্গে কৃষক-খাতকের অর্থনৈতিক প্রশ্নের তুলনাই চলে না। কংগ্রেস এটা মানতে পারতেন। কিন্তু মানেননি। দু'নম্বর দফাটাকে চার নম্বরে আনতে পারতেন। আনেননি। এটা নীতিগত কারণে নয়, কৌশলগত কারণেও কংগ্রেস রাজি হননি। বৈঠক ভেঙে গেল।

পরিস্থিতি ঘোলাটে দেখে হুমায়ুন কবীর ও মনসুর আহমেদ হক সাহেবকে বুঝিয়ে শরৎবাবুর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দারোয়ানকে দিয়ে শরৎবাবুকে ডাকলেন। কিন্তু ভগবান 'বাধ' সাধলেন। শরৎবাবুর নাকি 'বিজায় মাথা ধরিছে'। আজ কিছুতেই দেখা হওয়া সম্ভব নয়। মুসলিম লিগের নেতারা ওৎ পেতেই ছিল— 'হক সাহেবের অ্যাকেবারে ব্ল্যাংক চেক্ আগায়ে দিল'। 'জা-লিগ কোয়ালিশন' সই হয়ে গেল— 'দা চাইল্ড ইজ্ ডেড'। শিশুটি মারা গিয়েছে ছবি।
ফটিকের সাধ্য ও সাধনা দুইই ছিল হিন্দু-মুসলিম মিলন। কিন্তু রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে তার সাধনার অপমৃত্যু ঘটে। কোয়ালিশন মারা গেছে। মারা গেছে শিশুটিও। এক দুর্জ্ঞেয় যন্ত্রণায় সে অস্থির। তার দাঁড়াবার আর কোথাও জায়গা নেই। সে এখন 'ঘড়ির পেন্ডুলাম'। লেখক তার যন্ত্রণাকে নির্মাণ করলেন এভাবে—

> "সে তাহলে যাবে কোথায়? কোথায় সে আশ্রয় পাবে? মুসলমান তাকে সন্দেহ করবে হিন্দুর চর বলে, আর হিন্দু তাকে নিধন করতে দ্বিধা করবে না তার নামটা মুসলমানী বলে। তার ধর্ম ইসলাম বলে।"[৪]

হিন্দুদের গোঁয়ার্তুমিকে সে ভয় পেয়েছিল। মুসলিম রেনেসাঁর লজিকেও তার উদ্বেগ—

> "তুমি মুসলমান হলেই চলবে না। আমার নারায় তোমাকে গলা মেলাতে হবে। তুমি যদি তা না মেলাও তবে তুমি সন্দেহভাজন, তবে তুমি জাতিদ্রোহী, তুমি হিন্দুর চর, তুমি শত্রু!"[৫]

অথচ হিন্দুরা তাকে 'পচা শামুক' বলে মনে করে। তার আরো বড়ো যন্ত্রণা এই যে, সে বিদ্রোহ করতেও ইতস্তত করে। ভয় পায়। অথচ কোনো কাতারে গিয়ে সামিল হবার মতো অন্ধবিশ্বাসও তার নেই। আবার একা দাঁড়াবার মতো আত্মবিশ্বাসও সে হারিয়ে ফেলেছে— 'এ যে কী যন্ত্রণা, যে পায় শুধু সেই বোঝে ছবি'। -

> "তোমার বাচ্চা আবার হবে ছবি। তোমার বুকের দুধ নিষ্ফল ঝরে পড়বে না। তুমি মা হবে ছবি। তখন তুমি এই শোক, এই তাপ, এই জ্বালা ভুলে যাবে। হ্যাঁ ছবি তাই হবে। তাই হয়। কিন্তু আমি? আমার কী হবে ছবি? কোলে বাচ্চা এলেই তো তুমি জুড়োবার জায়গা পেয়ে যাবে। দাঁড়াবার জায়গা পাবে। কিন্তু ঘড়ির পেন্ডুলাম আমি, আমার দাঁড়াবার জায়গা কোথায়?"[৬]

বিধ্বস্ত ফটিক। কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন ভূমিষ্ঠ হয়নি। ভূমিষ্ট হতে পারেনি বিলকিসের বাচ্চাটাও। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য তাহলে আর হবে না! ওই সামান্য শর্তটুকু না মানার কারণে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু-মুসলমান আজও যে এক হতে পারে না। তাই ফটিকের মতো শিক্ষিত, নিরপরাধ, নিরপেক্ষ, বিবেচক মানুষকে মুসলমানরা সন্দেহ করে হিন্দুর চর ভেবে। আর হিন্দুরা তাকে নিধন করতে দ্বিধা করবে না নামটা তার মুসলমান বলে। তার ধর্ম ইসলাম বলে। বস্তুত, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমগ্র ভারতে অব্যাখ্যেয় দুর্জ্ঞেয় বাস্তবতায় ব্যক্তি হয়ে পড়লো বড়ো অসহায়। কোথায় তার যন্ত্রণা, কোথায় বা তার ব্যথা, ব্যাধি, বিপন্ন অস্তিত্বের সংকট গৌরকিশোরের উপন্যাসে বহু রৈখিকতায় ধরা পড়েছে।

ট্রিলজির শেষ উপন্যাস 'প্রতিবেশী'তেও তৎকালীন রাজনৈতিক আবহে মানবজীবনের সংকট ফুটে উঠেছে। কংগ্রেসের একাংশ হিন্দু নেতার উগ্র হিন্দুত্ববাদের কারণে মুসলমানরা কি গড্ডালিকার মতো দলে দলে মুসলিম লিগে যোগ দেবে, না কি পাকিস্তান দাবিতে মশগুল হবে? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে, না কি বিচ্ছিন্নতা তৈরি করবে? হিন্দুদের সঙ্গে 'লীন' হবে, না কি আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলবে? না কি সবরকম রাজনৈতিক চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ধর্মকর্মে আচ্ছন্ন হবে— এই সব নানা টানাপোড়েনে নিরপেক্ষ মুসলমানদের মনে এক ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সুরজিৎ দাশগুপ্তের গলায় তার সমর্থন পাই-

> "কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সঞ্চার ও শক্তিশালী করা ছিল হিন্দু নেতাদের একাংশের উদ্দেশ্য।"[৭]

১৯২৩ সালে বারাণসীর অধিবেশনে হিন্দু মহাসভার নেতারা দাবি করেন, 'We Hindus are a nation by ourselves'. স্বয়ং লালা লাজপত রায় গান্ধীর 'অহিংস' আন্দোলনকে 'দাস - মানসিকতার প্রকাশ' বলে অভিহিত করার পর তাঁর উদ্ধত মন্তব্য,

> "Non-violent, non co - operation could seriously weaken Hindu solidarity and thus adversely affect the freedom struggle".[৮]

১৯৩৩ সালে আজমের অধিবেশনে তাঁরা ঘোষণা করলেন—

> "Hindusthan is the land of the Hindus alone and Mussalmans and Christian and other nations living in India are only our guests".[৯]

টনক নড়েছে সাদিক স্যারের। টনক নড়েছে শামিমেরও? যে সাদিক স্যার শরৎচন্দ্রের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন, ধুতি ও শার্ট পরতেন, যিনি সবসময় মিলনের কথা বলতেন, সেই সাদিক স্যারকে দেখে শামিম অবাক— 'পরণে লুঙ্গি, মাথায় গোল সাদা টুপি'। বললেন, 'প্রত্যেকটা মুসলমানেরই আজ লিগের পিছনে এসে কাতার দেওয়া দরকার'। তা না হলে হিন্দুরা তাদের পিষে মেরে ফেলবে! হিন্দুদের মনে উদারতা আছে বলে একসময় তার মোহ ছিল, কিন্তু শরৎবাবু নাকি সেটা খালে ছুঁড়ে দিয়েছেন। তিনি শামিমকে বলেই চললেন—

> "হিন্দুরা কিছুতেই পাকিস্তান হতে দেবে না। কারণ হিন্দুরা মুসলমানের উন্নতি হোক, চায় না। কিন্তু হিন্দুরা চাক বা না চাক, আজ মুসলমানেরা জেগেছে, পাকিস্তানকে কেউ রুখতে পারবে না। মিলনের কথা আমরা ঢের শুনেছি মিলনের জন্য মুসলমান কম চেষ্টা করে নাই। দেশের বড় বড় মাথা কেবল এই বলেই শেষ করেন, হে হিন্দু, হে মুসলমান, তোমরা এক মায়ের দুই সন্তান' ... আমরাও একশতবার মানি সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে বৈদেশিক জাতি কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু যত গোল ওই সম্মিলিত হওয়ার ব্যাপারেই। মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানো এবং গো হত্যা নিবারণ করলে এ গোল মিটবেনা। মুসলমানদের ধর্মীয় উন্মাদনা দূর করলে কেবল চলবে না। হিন্দুর গোঁড়ামিকেও ধুইয়ে মুছে ভারত মহাসাগরে ফেলে দিতে হবে। হিন্দু মুসলমানের মিলনের মূলে যে কীট প্রবেশ করেছে তার আহার মুসলমানের ফ্যানাটিসিজম যদি এক ভাগ, তবে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি জোগায় তিন ভাগ। কিন্তু একথা কি হিন্দুরা স্বীকার করে? ... কাজেই তুমি আজ আর মিলনের ফেরেববাজিতে ভুলো না। নিজেদের দাবি থেকে পিছিয়ে যেও না। পাকিস্তান আমাদের চাই।"[১০]

এ কোন্ সাদিক স্যারকে দেখছে শামিম! তার মাথা বন বন করে ঘুরতে লাগলো। সে মুসলমান। মানুষ নয়— ! সে 'মুসলমান', ভুলতে চাইলেই কি হবে? ভুলতে দিচ্ছে কে? তার কলেজের সহপাঠীরা, কি হিন্দু কি মুসলমান, কেউই তাকে ভুলতে দেয়নি। এবার তার পিছনের কথা স্মরণ হয়—

> "এমন কি যাদের সঙ্গে আন্দোলন করেছিলাম, ভারত ছাড়ো, যাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলেছিলাম, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, জেলে সেই চোখেও ধরা পড়ল, আমি মুসলমান। মুসলমান বলেই আমি ওদের কোনো কিচেনে মাথা মাড়াচ্ছিনে। এঁরা প্রথমে বলেছিলেন, ও মুসলমান তাই কানা গরুর ভিন্ন গোঠ। পরে আমাকে সন্দেহ করতে লাগলেন, আমি একজন কমিউনিস্ট স্পাই।"[১১]

শামিম ভাবে। অমিতা ইতিহাস সংগ্রহে ব্যস্ত। 'পলিটিক্সে পোলারাইজেশনে'র কারণে দেশটা যদি ভাগ হয়ে যায়, তাহলে তাদের মিলনটা কোথায় হবে? ভারতে না পাকিস্তানে? তাদের ভালোবাসার জায়গাটাও কি হিন্দুতে আর মুসলমানে ভাগ হবে। অমিতা ভাবে। শামিম মেলাতে পারে না।

ক্যাবিনেট মিশন। আরো একটি আশা। ভারত স্বাধীন হবে। তায়েব-সুধাকর-হরিকিশোররা খুব খুশি। কোনো মতে এই মিশনকে বানচাল করতে দেবেন না। কিন্তু গান্ধীর 'ভেটো' প্রয়োগে 'ক্রিপ্স দৈত্য' ব্যর্থ। মৌলানা আজাদ গান্ধীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে কোনো প্রকারে স্বীকার করিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর 'কুইট ইন্ডিয়া', অখন্ড ভারত তাঁর চাই। অন্যদিকে জিন্নার 'ডিভাইড এ্যান্ড দেন কুইট'। গান্ধী কিছুতেই ভারত ভাগ মেনে নেবেন না। জিন্না অখন্ড ভারত চাননা। এর মীমাংসা করতে হবে ক্যাবিনেট মিশনকে। 'হোয়াট এ ফ্রাস্ট্রেটিং জব'। জিন্না মুসলিম লিগের সর্বেসর্বা, গ্রেট ডিকটেটর, সোল রিপ্রেজেন্টেটিভ'। অন্যদিকে, গান্ধী কংগ্রেসের 'সুপারম্যান'। দু'জন দু'জনের দাবি থেকে এক পাও

নড়বেন না। এমন অবস্থায় যুক্তি বুদ্ধির প্রয়োগ ও আপোষ ছাড়া তাঁদের হাতে আর কোনো হাতিয়ার ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেসি মৌলানা আজাদের মন্তব্য আরো জটিল করে তুললো। তিনি কোনোমতে পাকিস্তান মানবেন না। তিনি বললেন, ইসলামি তত্ত্বের দিক থেকে যেমন পাকিস্তান ছিল অসিদ্ধ তেমনি বাস্তব অবস্থার দিক থেকেও 'পাকিস্তান প্রস্তাব' মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর। বহু তর্কাতর্কির পর অবশেষে সবাই সেটা মেনে নিয়েছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। মুসলিম লিগও মিশনের ফরমুলা মেনে নিয়েছিল। সবাই ভেবেছিলেন জিন্নাকে পাকিস্তানের দাবি থেকে নড়ানো যাবে না। কিন্তু তিনিও নড়েছিলেন। তাহলে ভেস্তে গেল কী করে? তরী ডুবলো কেনো? না কি ফুটো তরীকে আর তালি দিয়ে চালানো গেল না?

গণপরিষদ গঠিত হবে। ৩৮৭ জন সদস্য। দেশ উল্লসিত। ক্যাবিনেট মিশন উল্লসিত। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলও আনন্দিত। অন্তবর্তী সরকারের ১৪ জন মন্ত্রীর নাম ঘোষিত হল। তার মধ্যে প্রথম নামটাই জওহরলাল নেহেরুর। দ্বিতীয় নামটি মোহাম্মদ আলি জিন্নার। এরপর, একের পর এক নাম পড়া হল। হঠাৎ হরিকিশোর মেশো বলে উঠলেন, 'শরৎ বোসের নাম নেই কেন? তিনি তো এখন ভাইসরয়-এর কাউন্সিলের অপজিশন লিডার'। পার্লামেন্টারি প্রথানুসারে তারেই তো মন্ত্রীসভা গঠন করার কথা। অথচ তিনিই মন্ত্রীসভা থেকে বাদ। মুসলিম লিগ অন্তবর্তী সরকার সম্পর্কে ক্যাবিনেট ১৬ই মে-র প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল কিন্তু কংগ্রেস এবং অন্যান্য মাইনোরিটি দল সেটাকে খারিজ করে দিয়েছে। আশা-তরীর পাটাতনে এটা একটা বড়ো ধাক্কা। আলাপ আলোচনার শর্তই হল কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে সেটাকে কাজে পরিণত করা। মাঝখানে কোনো ফ্যাকড়া নয়। কিন্তু গ্রুপিং ব্যবস্থায় কী হয়েছিলো? কংগ্রেস, মুসলিম লিগ সবদিক বিচার করে গ্রুপিং ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলো। তিনটি গ্রুপ ছিল এ-বি-সি। 'সি' তে রাখা হয়েছিল বাংলা ও আসামকে। গান্ধী, কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এটাকে সরকারি ভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বরদলুইয়ের চাপে গান্ধীও আসামকে বাংলার সঙ্গে জোট বাঁধার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন। আলোচনার সাপেক্ষে একটার পর একটা ধাপ পেরোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। যার প্রথম ধাক্কাটা মারলেন স্বয়ং মহাত্মা। তারপর থেকে কেবলই ধাক্কা-

দ্বিতীয় ধাক্কা মারলেন জিন্না। তাঁর অভিযোগ, বড়লাটের সঙ্গে তাঁর যা কথা হয়েছে তাতে মন্ত্রীসভার বারোজন মন্ত্রী নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের চাপে পড়ে বড়লাট আরো দু'জন মন্ত্রীপদ বাড়িয়েছেন। এবং সে দুটি হিন্দুদেরই দিয়েছেন। কেনো এমনটা হল? কৈফিয়ৎ তলব। শেষ ধাক্কা দিলেন জওহরলাল নেহেরু। সদ্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, ওয়াভেলকে অন্তবর্তী সরকার গঠন করতেই হবে এবং সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনিই। এতে মুসলিম লিগ যোগ দিক বা না দিক। তিনি বললেন -

> "কংগ্রেস কেবিনেট মিশনের দীর্ঘমেয়াদি অথবা অল্প মেয়াদি কোনও পরিকল্পনাই গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস কেবলমাত্র প্রস্তাবিত গণপরিষদে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছে এবং সে গণপরিষদ হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম। ভারতের যে সংবিধান গণপরিষদ রচনা করবে তদনুযায়ীই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।"[১২]

নেহেরুর এই বক্তব্যকে রিনির বাবা কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের 'মৃত্যু পরোয়ানা' বলে ধরেই নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, জিন্নাও তাঁর বক্তব্যে প্রমাদ গুনলেন। ডিরেক্ট অ্যাকশন (১৫ই আগস্ট ১৯৪৬) শুরু হল, যা ভারত ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। হাজার হাজার নরনারী ও শিশুর মৃত্যু হয়েছিল-

> "বেঁচে থাকতে যারা মিলতে পারেনি, মৃত্যু এসে তাদের এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছিল যে, বোঝা যায়নি কে হিন্দু আর কে মুসলমান। এই সব শনাক্তহীন মৃতদেহ পাশাপাশি শুয়েছিল মহল্লায় রাস্তায় মাঠে ময়দানে। শেয়াল কুকুর চিল শকুন তাদের সদগতি করেছে। কেবল ওরাই জাত বিচার করেনি।"[১৩]

গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটি সত্যিই ভারত ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায়। রাজনীতি ও ব্যক্তি স্বার্থকে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে, যুক্তি বিচারবোধ হারিয়ে মানুষ যেভাবে হিংস্র হয়ে উঠে দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে, একে অপরের প্রতি হিংসায় যেভাবে মানুষ মানুষকে খুন করেছে, তা ভারতবাসী কোনোদিন ভুলবে না। দেশের নেতাদের কুকর্ম ব্যক্ত করতে গৌর পিছপা হননি। তাঁদের মুখোশ খুলে দিয়ে ভারত ইতিহাসের যথার্থ সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন।

হিন্দু মুসলমানের প্রতিবেশী। মুসলমান হিন্দুর প্রতিবেশী। ভারতবর্ষে হিন্দু- মুসলমান জন্ম থেকেই একে অপরের প্রতিবেশী। তবুও প্যাটেল জিন্নাকে বিশ্বাস করতেন না। জিন্নারও কংগ্রেস নেতাদের সদিচ্ছায় আস্থা ছিল না। গান্ধীকেও না। অথচ এঁরা দুজনেই ছিলেন গুজরাটী। প্রতিবেশী। কি অবিশ্বাস! কতো ঘৃণা! হ্যাঁ, হিংসা, অবিশ্বাস আর ঘৃণার কারণে দেশভাগ হয়েছিল। হিন্দু মুসলমানকে বিশ্বাস করেনি। মুসলমান হিন্দুকে। সাম্প্রদায়িকতার কালো থাবা বার বার আছড়ে পড়েছিল সাধারণ জনগণের উপর। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে গান্ধী যিনি অখন্ড ভারত চাইতেন, শেষ পর্যন্ত তিনিও দেশভাগকে সমর্থন করেছিলেন। তাই দেশভাগ কোনো সম্প্রীতির বার্তা বহন করে না। কারণ দেশভাগ হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের শত্রুতার উপর ভিত্তি করে। মৌলানা আজাদ তাই মন্তব্য করেন-

> "Can anyone deny that the creation of Pakisthan has not solved the communal problem, but made it more intense and harmful? The basis of partition was enmity between Hindus and Muslims."[১৪]

Reference :

১. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ. ২৪৮

২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

৩. ঘোষ, গৌরকিশোর, প্রেম নেই, আনন্দ পাবলিশার্স, একাদশ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ ২৪৮

৪. ঘোষ, গৌরকিশোর, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৭. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ, ভারতীয় মুসলমানদের সংকট, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৯, পৃ.৬৪

৮. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ, মৌলবাদ, ডি. এম লাইব্রেরি, ১৯৯৫, পৃ. ৬৭

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮ তে Craig Bater লিখিত- 'The Sangh : A biography of an Indian Party' থেকে উদ্ধৃত।

১০. ঘোষ, গৌরকিশোর, প্রতিবেশী, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ১৯৯৮, পৃ. ২৭৩

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

১৪. Azad, Abul Kalam, India Wins Freedam, Calcutta, 1959, page. 226